International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-I, July 2016, Page No. 11-19
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

সুবোধ সরকারের কবিতা : সময়, স্বদেশ ও রাজনীতি

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নাহাটা যে. এন. এম. এস. মহাবিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Poet Subodh Sarkar was born in 1958 in the krishnanagar city of west bengal. He has got the 'Sahitya Academy' prize from the Govt. of India in the year 2013. He is one of the disputed poet among the poets of modern Bengali poetry. With the viewpoint of his truthful political ideas he has sketched the contemporary time and people of his homeland. The perturbation against dirty politics, terror-stricken race-hatred, indignity and oppression on women and poverty of common class people stir him immensely. The realistic values of his poetry like 'Eka Norokgami' (1988), 'Morubhumir Golap'(1990), 'Arai Hat Manush'(1992),'Jerujalem theke Medinipur'(2001), 'Ja Uponishod tai Quran' etc. are unblemished. Without fearing the blood-shot eyes of the political evils of his period, he has elevated his questions and purposes to write down his poetry in front of his reader. Above all, the hunger, tear and poverty of common class people are densely picturized in his compositions.

Key Words: Poet Subodh Sarkar, Perturbation against dirty politics, Terror-Stricken Race-Hatred, Opression on Women, Poverty of Common People.

কবি সুবোধ সরকারের জন্ম ১৯৫৮ সালে। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তিরিশের অধিক।রচনাকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩ সালে তিনি পান ভারত সরকারের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। শিক্ষকতার পাশাপাশি, ইংরাজী সাহিত্য, আন্তর্জাতিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর যোগসূত্র নিঃসন্দেহে তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রটিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতৃদেব ছিলেন পাবনা জেলার লোক। দেশভাগের সময় হাজার হাজার মানুষের মতো তাঁর পিতা-মাতাও স্বদেশ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণনগরে চলে আসেন।শরনার্থী হওয়ার যন্ত্রণা তাঁকে ছোটবেলা থেকেই অনুভব করতে হয়েছিল। অনুভব করতে হয়েছিল ক্ষুধার যন্ত্রণা। তবু সেই যন্ত্রণার কথা তিনি কখনও তাঁর কবিতায় প্রধান করে তোলেননি বরং স্বদেশ ও দেশবাসীর যন্ত্রণা বরাবর তাঁর নিজের জীবনের দুঃখ যন্ত্রণার থেকে বড় হয়ে উঠেছে।

সহধর্মিনী কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের সাথে একযোগে বের হয় তাঁর ও মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার বই 'সুবোধ মল্লিকা স্কয়ার' এবং সম্ভবতঃ এটিই বাংলা ভাষায় লেখা একসঙ্গে দুজন কবির প্রথম কবিতার বই।

বর্তমান বাংলা কবিতার জগতে সুবোধ সরকার এক বিতর্কিত কবি। ব্যর্থ বামপন্থার দৃষ্টান্ত তাঁকে স্বাধীন মতামত প্রদানের সেই অধিকার দিয়েছে ততখানিই, যতখানি দিয়েছে বিতর্ক। কবি দেখেছেন খাদ্য,পানীয়, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারগুলো মানুষকে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন বামপন্থীরা আর তাই নতুন

প্রতিশ্রুতি আর উদ্দীপনাময় নবগঠিত সরকারকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। বামপন্থী সমালোচনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। সেইসঙ্গে হিন্দুইজম এর নামে হিন্দুত্বের শাসানির রাষ্ট্রীয় কৌশলকেও বিরোধিতা করেছেন তিনি। কবিতার মধ্যে দিয়েও তার প্রকাশ ঘটেছে।

তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে 'পপিউলিস্টিক' কবিতা লেখার অভিযোগ কিংবা সাম্প্রতিক ও বিশেষতঃ রাজনৈতিক স্পর্শকাতর বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লেখার অভিযোগকে কবিতা দিয়েই নস্যাৎ করেছেন তিনি। সেইসঙ্গে 'জার্নালিস্টিক' তকমা নিয়েও তিনি চিরকাল ভরসা করেছেন সত্যিকারের সহজ নিমগ্ন পাঠকের উপর।

জনপ্রিয়তার লোভে সুবোধ সরকার কখনও তাঁর কবিতাকে বিসর্জন দেননি, বিসর্জন দেন নি খ্যাতি ও সম্মানের লোভে আর ফলতঃ তাঁর নিজের ভাষায় "আসামের চা-বাগান থেকে কাক দ্বীপের সেলুনে আমার এই বইটিকে ঘুরতে দেখছি। এ বই আমি লিখিনি, লিখেছেন পাঠক। প্রণাম বাংলা ভাষার পাঠককে। পাঠক, আপনি আমার কান মলে না দিলে আমি লেখা ছেড়ে দিতাম। কেউ আমাকে পুরস্কৃত করেননি, কিন্তু আপনারা আমার আসল পুরস্কার। এ বক্তব্যেই কবির প্রকৃত স্বীকারোক্তি।সুবোধ সরকার বিশ শতকের আশির দশকের কবি। বস্তুতঃ সংবেদনশীলতায়, অনুভূতির গাঢ়তায়, অকুণ্ঠ বাস্তবের প্রকাশে বাংলা কবিতার জগতে তিনি এক ব্যতিক্রমী কবি। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন স্বদেশের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস রয়েছে তেমনি সেই মানবতাবাদকে তিনি বিশ্বজনীন করে দিতে পেরেছেন। প্রাত্যহিক জীবনের খণ্ড খণ্ড অনুভূতিগুলোকে তিনি এক চিরন্তন অনুভবে সজ্জিত করে তোলেন। রাজনীতি থেকে সমাজ, দেহাতি মানুষের দুঃখ দুর্ভার জীবন থেকে নাগরিক জীবন ও প্রেম সকল কিছুর ভিন্নমাত্রিক বিশ্লেষণে তাঁর অবাধ গতি।

কৃষ্ণনগর জেলা সদরে বড় হওয়া কবি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতার' র ভূমিকায় বলেন : "কৃষ্ণনগরের ১ নম্বর প্লাটফর্মে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আমরা স্কুলের বন্ধুরা আড্ডা দিচ্ছিলাম। শিয়ালদার দিক থেকে ট্রেন আসছিল। হঠাৎ শুনলাম গেল গেল একটা চিৎকার। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি চলন্ত ইঞ্জিনের সামনে পড়ে থাকা একটা পাঁউরুটি তুলে নিতে ঝাপিয়ে পড়েছে একজন। ট্রেন চলে গেল এবং থামল। দুটো কোচের মাঝখান দিয়ে দেখতে পেলাম লোকটা ২ নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেই পাঁউরুটি খাচ্ছে আর হাসছে। পাঁউরুটি আর মৃত্যুর মাঝখান থেকে উঠে আসা ওই হাসি আমাকে সারারাত ঘুমোতে দেয়নি। পরের দিন ভিরু হাতে একটা কবিতা লিখেছিলাম,হুবহু যা দেখেছি তাই। আমার প্রথম কবিতা, যা হারিয়ে গেছে, যা কেউ কখনও পড়েনি। শ্রেষ্ঠ কবিতার পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে বসে বুঝতে পারলাম, কবিতাটা হারিয়ে যায়নি। কবিতাটা আমার গত ২৪ বছরের লেখালেখির ফাঁকে ফোঁকরে কমা সেমিকোলনের মতো শুয়ে আছে। দুটো বই-এর মাঝখানে যে ফাঁক, দুটো কোচের মাঝখানে যে ফাঁক, সেই চন্দ্রালোকিত ফাঁক দিয়ে আমি আজীবন ওই হাসিটা দেখে চলেছি। ওই হাসিটার নাম ভারতবর্ষ। আমি ওই হাসিটা আবার দেখলাম গুজরাটে, আফগানিস্থানে, আমেরিকায়"।

বলাই বাহুল্য, জীবন থেকে উঠে আসে কবিতা কিন্তু তা যখন অনুভবের মধ্যে দিয়ে মহৎ ভাবনায় উত্তরণ করে, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে, ভাবসমুদ্র মন্থন করে তখনি তা ব্যাপকতর অর্থে হয়ে ওঠে মহত্তম সৃষ্টি। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটুকরো হাসিকেই এভাবে সৃষ্টির স্বাক্ষরে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন কবি সুবোধ সরকার নানা সংবেদনে, বিচিত্রতর ভাবনায়।

সুবোধ সরকারের জীবনে দারিদ্র ছিল, ছিল বঞ্চনা, ক্ষুধা। বাবার ক্যান্সার, ভিক্ষাবৃত্তির অর্থে বড়দির বিয়ে, সেজদার পাগল হয়ে যাওয়া তাঁর জীবনকেও শেষ করে দিতে পারতো কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্ম তাঁর। গীতবিতানের একটি ছেঁড়া বই থেকে তাঁর উঠে আসার লড়াই-ই তাঁকে অকাদেমী পুরস্কারের মূল্যবান সম্মানের পথ পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছিল।

'ঋক্ষ মেষ কথা' দিয়ে যার যাত্রাপথ শুরু, আটের দশকে লেখা তাঁর 'কবিতা ৭৮-৮০' শুরু করেছিল যে চলার গতি পরবর্তীকালে 'প্রতিকবিতা'র প্রবক্তা যে সেই দশকের এক সচেতন নিষ্ঠাবান কবি তাঁর প্রমাণ পাই 'রাজনীতি' কবিতায়। এই রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা সুবোধ সরকার বারবার করেছেন।লক্ষণরেখা অতিক্রম করেছেন বারবার।

'সাহিত্য অকাদেমি-২০১৩'পুরস্কারে সম্মানিত সুবোধ সরকারের কাব্যগ্রন্থ 'দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে' প্রসঙ্গে সমালোচক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

"এ বছর 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কারে সম্মানিত সুবোধ সরকারের 'দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে' হাতে নিয়ে এমাথা থেকে ওমাথা যেতে আস্তে প্রথমেই মনে হলো, বইটা একটা গনগনে উনুন। সেখানে আগুন যেমন দেখা যাচ্ছে,আগুনের নীচের কয়লা আর উপরের রুটিও ঠিক তেমনিই দেখা যাচ্ছে। এবার আটার একটা গোলাকৃতি জিনিসকে যে উনুনের উপর রাখছে আর ফুলে ওঠা রুটিকে সরিয়ে নিচ্ছে আগুন থেকে, হাত পোড়ার সম্ভাবনা তারই সবচেয়ে প্রবল। তাই পাঠক হুঁশিয়ার। এ বই কোনও প্লাস্টিকের গোলাপ নয় যে আঙুল বুলিয়ে মুগ্ধ হওয়া যাবে। নিকানোর পাব্রা না কি মিরোস্লাভ হোলুব, 'প্রতিকবিতার' কোন ঘরানায় এর অবস্থান তা বলতে পারবনা, তবু এটুকু বলতেই পারি, এই বই কবিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোথাও একটা ধাক্কা দিয়ে যাবে"। বস্তুতই 'প্রতিকবিতার এই সংবেদনশীল ও জোরালো প্রত্যাঘাত বাংলা আধুনিক কবিতাকে নাড়া দিয়েছে সন্দেহ নেই। একসময় 'ভাষানগর' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন কবি সুবোধ সরকার। কবিতা রাজ্যে সামান্য থেকে বিশেষ ও বিশ্বায়নে পৌঁছানোর অনায়াস লব্ধ প্রয়াসই তাঁর অন্যতম এক দক্ষতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁর 'জেরুজালেম থেকে মেদিনীপুর' কবিতাটির কথা, যেখানে কবি দেখান মেদিনিপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে সাধারণ মানুষ যে রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার আসলে সে নির্যাতন ও অত্যাচার সারা বিশ্বব্যাপী ঘটে চলেছে। দেশের রাজনীতির আঙ্গিনায় রাষ্ট্রিক সিদ্ধান্ত ও দল মতের মূল সুত্রগুলিকে সমালোচনা করেছেন,আঘাত করেছেন সরাসরি তিনি তাঁর কবিতায়, করেছেন আক্রমণ।

কবিতার ক্ষেত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অথবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অথবা শঙ্খ ঘোষের কাব্য ভাবনার সাথে কবি সুবোধ সরকারের কাব্য ভাবনার কোথাও কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় কোনো কোনো স্থানে কবি সেকথা স্বীকারও করেন।

ছোটবেলায় যার জীবন শুরু দারিদ্র, অনাহার, নকশাল আন্দোলনের উত্তাপ আর মায়াকোভস্কির গ্রন্থ দিয়ে পরবর্তীতে দুই বাংলার বুকে তিনিই বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন তার 'শাড়ি', 'কাল্লু', 'রূপমকে একটা চাকরি দিন', 'ময়ুরপঙ্খি' কবিতার মধ্যে দিয়ে।

সুবোধ সরকারের অন্যতম কাব্যগ্রন্থগুলি হলো; 'ঋক্ষমেষ কথা' (১৯৮২), 'সোহাগ-শর্বরী' (১৯৮৫), 'একা নরকগামী (১৯৮৮), 'মরুভুমির গোলাপ' (১৯৯০), 'চন্দ্রদোষ ওষুধে সারেনা' (১৯৯১), 'আড়াই হাত মানুষ' (১৯৯২), 'ছিঃ' (১৯৯৬), 'ভালো জায়গাটা কোথায়' (১৯৯৬), 'ধন্যবাদ মরীচিকা সেন' (১৯৯৬), 'জেরুজালেম থেকে মেদিনিপুর' (২০০১), 'কাল্লু' (২০০২), 'মনিপুরের মা', 'যা উপনিষদ তাই কোরান' ইত্যাদি।

এছাড়াও প্রায় ১৫৬ টির মতো সনেটের রচয়িতা তিনি। তাঁর কবিতার একটা অংশ জুড়ে আছে জাতীয় রাজনীতির প্রতিবন্ধকতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দুত্ববাদের শাসানিকে তিনি মেনে নিতে পারেননি, সে কারনে তাঁর কবিতায় গুজরাটের দাঙ্গা প্রসঙ্গ বারেই বারেই এসেছে।

কবি সুবোধ সরকার একসময় তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেনঃ "...আমি একটা জেদ নিয়ে বেঁচে আছি যে কবিতার শরীর থেকে সব গয়নাগাঁটি খুলে ফেলবো। তাতে যদি কবিতা মার খায় খাক। এ কাজ আমার আগে অনেকে করে গেছেন। আমি আর একবার করবো। কবিদের মধ্যে একটা লক্ষণ রেখা আছে সেটা

মেনে চলতে হয়।কিন্তু কেন মেনে নেব? কেন আমি অন্যের জামা পরবো? কেন আমি অন্যের থালায় খাবো? ভিখিরিরও একটা নিজস্ব থালা থাকে"।

কবিতাকে বাস্তববাদী, প্রখর ভাবে গণচেতনা মুখর করে তোলার চেষ্টা আধুনিক কালে অনেক কবিরাই করেছেন ও করে চলেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রহমান, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী অথবা জয় গোস্বামীর কবিতায় তারই ইঙ্গিত পাই। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিতে সুবোধ সরকার এক অনন্য নজির। তাঁর বলা 'ভিখিরির থালা'টি অর্থপ্রাপ্তি অথবা 'তাঁবেদারীর মোহ' দিয়ে গড়া নয়, বরং রাষ্ট্রিক অথবা সামাজিক সত্যিগুলোকে বাঁইয়াতে চাঁটির মতো সপাটে আছড়ে তোলে পাঠকের মনদর্পনে। পাঠক তাঁরই কথা সূত্র ধরে আওড়ে যায় মনোলগের মতোঃ ' প্রতিটি লোকের মধ্যে একটা হারামি আছে'।এই যে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি- এর মধ্যে শুধু সাহসী আত্ম-উন্মোচনই নেই শুধু- তার থেকে বড়ো যা আছে তা হল কবিতায় নয়। উজ্জীবনের এক নয়া ঘরানাকে প্রতিষ্ঠিত করার বুকটান করা দাপট।স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তাঁর কবিতা সৃষ্টি কল্পনার অলীক মায়ামৃগ নয়; মান্ধাতা সমস্যাগুলিকে কঠিনতর করে দেখাবার সাবেকী কসরৎও নয়, তিনি নিজের রচনা শৈলী ও নির্মাণ ক্ষমতার জোরেই সমসাময়িক অনেকের চেয়ে নিজেকে এগিয়ে রাখতে পারেন। যে রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুকে আড়াল করতেই কবি-সাহিত্যিকরা স্পষ্টতায় ভয় পান, সুবোধ যেন সেখানে খাপখোলা তরোয়াল। তাইতো বলতে পারেনঃ

"এ সব চিন্তা আগে করতাম, আর করিনা
ছোটমুখে একটা বড় কথা বলিঃ
কবিতাকে শেষ অব্দি কবিতাই হতে হবে
তা সে বেশ্যার দেওয়ালে ছাপা হোক্
অথবা পুরোহিতের উঠোনে।
আপনি রবীন্দ্রসদনে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়বেন
না জাহান্নমে
সেটা আপনিই ঠিক করুন
আমি বুঝে গেছি আমি কবি নই
আমি আরশোলা"।(ছোটমুখে ছোটকথা)

কবি জানেন আসলে ভালো-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল যেমন কবিতায় তেমনি বাস্তবেও আসে রুঢ় বাস্তবের বেশেই, কবিতাকে কাব্য নামক নেকামি কিংবা প্যানপেনানি হলে চলে না। নিছক গা জোয়ারী করে কবিতা পাঠে নাচার পাঠককূলকে উদ্বুদ্ধ করা কবির কাজ নয়। অকাদেমী নামক পুরস্কারের প্রত্যাশা নয়,মহত্বের লক্ষ্যে পৌছানোই পিপিলিকাকে বৈজ্ঞানিক করে, বাবুইকে করে স্থপতি- আর কবিতা গড়ার সেই চ্যালেঞ্জই কবিকে করেছে আরশোলা। তবে আমরা জানি এ আরশোলা খ্যাতির দেওয়ালে নিজের পিঠ ঠেকে যাওয়ার আগে পর্যন্ত চূড়ান্ত আত্মসচেতন। খ্যাতি যেমন তাঁর অনাকাঙ্খিত নয় তেমনি খ্যাতির বিড়ম্বনাও তাঁর আক্ষেপ হয়ে উঠতে পারেনি কোনদিন।

এই খ্যাতি অখ্যাতির প্রশ্নেই নিন্দুকেরা বলেন সুবোধের মুখে রাজনৈতিক সুবিধা বাদ বিরোধী শ্লোগানের অভিরুচি আসলে ব্যাক্তি সুবিধাবাদের কুলুকুচি। এ যেন নয়া রাজনীতির বিজ্ঞাপনী কোন মুখে থেকে যাওয়া সুবোধ-এরই সুবিধাবাদী আশ্রয়। কিন্তু 'দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে'র কবি কি এতখানিই নিশ্চিত? তিনি তো জানেন 'এখনো জীবন মানে হিরের পাতাল' কৃষ্ণনগরের জেলা সদরে বড় হওয়া একটি ছেলে তাঁর কবিতায় কখনও নিজের অতীত, দুঃখময় জীবনের কথা বলেনা। বাস্তবিক তাঁর Angry Image তা বলতে ঘৃণাবোধ করে। মনুষ্যত্বের সহানূভূতির ভিজে ফুল দিয়ে কবিতার নৈবেদ্য সাজানোর চেয়ে নিজের Reactions, restlessness আর Revolutionary Image দিয়ে বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে চলে যাওয়া তিনি বেশী পছন্দ করেন। পাপ-তাপ-দ্বেষ আর মনুষ্যত্বহীনতার

অবশেষ পড়ে তাঁর চিন্তনের বেলা ভূমিতে। জল-ভাত মিথ্যাচারণ, সানন্দ অবমূল্যায়ণ অথবা নিরন্তর ধর্ষণের পৃথিবী,প্রীতিহীন সমাজ, ভণ্ড-রাজনীতির নবোঢ়া লাজ অথবা সাম্প্রদায়িক শক্তির মনোমোহিনী সাজকে যখন অন্যে দেখেও দেখেনা, অথবা মুখে বুলি চোখে ঠুলির কারনে প্রকৃত যা তা অধরাই থেকে যায় তাকেই শব্দের অভ্রভেদী শরে বিদ্ধ করে-জর্জরিত করে তোলেন কবি সুবোধ সরকার। তাঁর শরীরের তীক্ষ্ণাগ্রে বিষ আর পুচ্ছে কৌতুকের ফুলরেণু। আর অন্যদিকে তারই স্বদেশ চেতনা, মানব প্রেম আর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা বুঝিয়ে দেয় তিনি এক আলাদা গোত্রের কবি, আলাদা মাত্রার কবি।

সুবোধ সরকারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর নিজের প্রসঙ্গটির অবতারণা করা যায়। শূন্য দশকের কবি শিমূল সালাহউদ্দিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (ঢাকা, ৩১শে অক্টোবর, ২০১৪) কবি বলেন : "প্রথম বই কিছুতেই বেরোতে চাইছিল না। প্রথম বই বলে একটু কনফিউশন আছে। দুটো আসলে আমার প্রথম বই। একটা বই এর নাম হচ্ছে 'কবিতা ৭৮-৮০'। ওই সময় আমি কবিতাগুলো লিখি। সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটা বই লিখেছি, সে বইটা 'ঋক্ষমেষ কথা'"। এ হিসাবে কবির এ দুটি বই-ই প্রথম বই, যদিও প্রকাশকালের বিচারে 'কবিতা ৭৮-৮০'ই এগিয়ে।

সুবোধ সরকারের 'ঋক্ষমেষ কথা' লেখকের নিজের মতে এক অসম্ভব দুর্বোধ্য কবিতার বই। তিনি বলেন : "এখনো বইটি খুলে যখন পড়ি, আমার কছে দুর্বোধ্য মনে হয়। বিস্ময়কর লাগে। বিস্ময়কর লাগে এ জন্য যে আমি এতো দুর্বোধ্য বই কেন লিখেছিলাম"। নাম কবিতা 'ঋক্ষমেষ কথা'য় কবিতার রাজ্যে তাঁর স্বরূপকেই যেন বুঝিয়ে দেন তিনি। কবিতাটিকে চিত্রফল অথবা রূপকথাময় প্রহেলিকা যাই মনে হোক না কেন, আসলে এর আপত দুর্বোধ্যতার মধ্যেই কবি ও কবিতার এক পৃথক দায়বদ্ধতা ফুটে ওঠে। কবি যখন বলেন:

"এক গন্ধর্বের ছেলে মেয়ে সূর্যাস্ত দেখতে এসেছে
আমি তাদের মাঝখানে পিঠে কুঁজ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি
কুঁজের অগণিত মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে কীট"।

শিব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন জগতের হলাহল পান করে, আর একালের কবি নিজেকে সমালোচনার বিষে জর্জরিত, অদ্ভুত দর্শন, কুশ্রী করেও সমাজ, প্রকারান্তরে সূর্যাস্ত দর্শনের সৌন্দর্যাদর্শ থেকে নিজেকে বঞ্চিত না করে সুরূপ গন্ধর্বের ছেলে মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কারণ কবি জানেন অমৃতকে গ্রহন করতে গেলে গরলকে পান করতে হয় আর সে গরল পানে আর সকলে সম্মত ও সক্ষম না হলেও সমাজের বুক থেকে উঠে আসতে হয় কোনো কবিকেই যার মধ্যেকার অপ্রকৃতে নেই কোনো হাহাকার, কৌতুক ঢাকেনা তাঁকে যখন 'ঋক্ষমেষের' ন্যায় কোনো অদ্ভুতত্বের উপমায় তুলনা করা হয় তাঁকে। এর সাথে মিলিয়ে নেওয়া যায় তাঁর 'ছোট মুখে ছোট কথা' কবিতার লাইনগুলি:

"এসব চিন্তা আগে করতাম, আর করিনা
ছোটো মুখে একটা বড় কথা বলি:
আমি বুঝে গেছি আমি কবি নই
আর আরশোলা"।
আর এ কবিতার লাইনটি
"আজ, আমার আর কষ্ট হয়না,
প্রথম প্রথম অনেকেই ভয় পেত"। ('ছোট মুখে ছোট কথা')

এ কবিতার মধ্যে myth এর এক অনুপম চিত্রকল্প মিশে আছে। জন্মক্ষণ থেকে 'ঋক্ষমেষ' দেখে যেমন চমকে ওঠে তাঁর জন্মদাত্রী মা, স্বাভাবিকভাবেই, তেমনিভাবেই কবি যেন জন্মক্ষণ থেকেই এক অদ্ভুত দাহিকা শক্তির

অগ্নিবলয়ে আবির্ভূত তাঁর কবিতাদাত্রী অন্তঃশীলতা থেকে যেখানে স্রষ্টা থেকেও সৃষ্টির যন্ত্রণা বড়, তাই সৃষ্টির বিস্ময়ও বড়।

'ঋক্ষমেষ কথা' কবিতার 'কথা' শব্দটি সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা যেতে পারে। কবি কবিতাটির একটি লাইনে বলেন:

"এই ঋক্ষমেষ গল্পের ভেতর কোনো হাহাকার নেই, কৌতুক ঢাকেনি কোথাও। 'কথা' শব্দটি সাধারণতঃ 'কাহিনী' বা 'গল্প' বোঝাতে ব্যবহৃত হয় আর এ কবিতায় চিত্রকল্পে, myth এর আবহে যে 'ঋক্ষমেষ' উঠে এসেছে তাকে মিথ বাহিত কোনো কাহিনীরই চরিত্র বলেই মনে হয়। এখন সুবোধ সরকারের কবিতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রায়শঃয়ই ওঠে তা হলো কবিতায় গল্প বলতে চান তিনি। এ অভিযোগ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ক্ষেত্রেও উঠে। শিমূল সালাহউদ্দিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কবির এ প্রসঙ্গে উত্তর হলো:

"এ অভিযোগ যারা করেন, তাঁদের আমি সারা পৃথিবীর কবিতার দিকে তাকাতে বলি"। তিনি 'ওড টু নাইটিংগেল', শেলীর স্কাইলার্ক, টি. এস. এলিয়ট এর ওয়েস্টল্যান্ডের কথা বলেন। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' ও এর সমগোত্রীয়। কবিতায় গল্পটাই প্রধান। উপন্যাস, নাটক অথবা ছোটগল্পে কখনো কখনো যেমন মিথের আবহে উঠে আসে বর্তমান, পুরাণের আবহে সমসাময়িকতা, 'ঋক্ষমেষ কথা' ও তাই।

শিমূল সালাহউদ্দিন তাঁর সাক্ষাৎকারে কবিকে গণ্য করেন 'এক প্রচণ্ড বঞ্চিত মানুষ লিখছে অভাবের পাণ্ডুলিপি' বলে কারণ তাঁর সব কবিতায় তিনি প্রচন্ডভাবে উপস্থিত থাকতে দেখেন অভাবকে। কবিতার অলঙ্কারহীনতাও কি সে কারণেই? সব কবিতায় না হলেও বেশ কিছু কবিতায় এই বঞ্চিত দীনের হাহাকারকে স্পষ্টায়িত হয়ে উঠতে দেখতে পাই। তেমনই এক কবিতা হলো: 'রুটি'। এ কবিতায় কবির আহত বিবেকের করুণার্দ্র প্রকাশকে ঘনীভূত হয়ে উঠতে দেখি যখন তিনি বলেন:

সূর্য যেন স্ট্রিটে নিজে বানিয়ে যে বালক রুটি বিক্রি করছে
মাত্র আড়াই টাকায় ভাত বিক্রি করে যে বিধবা মেয়েটি
মাথা নীচু করে বসে থাকা চটকল শ্রমিক
তোমাদের নিয়ে আমরা অনেক ভেবেছিলাম, কিন্তু
কী করতে পেরেছি বলো?

বাজেটে জিনিসের দাম বাড়ে, বাড়ে ভোগপণ্যের দাম। কিন্তু যে ভোগপণ্যের দাম বাড়ে তা যারা তৈরী করে তাদের শ্রমের দাম বাড়েনা। সাবান, কনডোম অথবা বিলিতি মদ সবই ধনীর বিলাসিতার উপকরণ, সাধারণের এর প্রয়োজন কম, বিশেষতঃ নিম্নবিত্তের, বস্তিবাসীর। আর কবি? যার বিষয় সাধারণ অথবা অসাধারণ আপাতভাবে কোনো বিষয় অথবা বস্তুই নয় তিনিও কি ভোলেন নিজের আত্মগ্লানির মন্থনে উঠে আসা সেই সহজ প্রতিপাদ্য সত্যকে যা বিশেষ সত্যে রূপান্তরিত হয় তাঁর কবিতার ভাষায়?

কিন্তু সারা পৃথিবীতে (জাপান ও আমেরিকা ধরে)
দিনে যত টাকার পণ্যদ্রব্য বিক্রি হয়
তার তেরগুণ বিক্রি হয় অস্ত্র ('রুটি')

দরিদ্রের পেটে লাথি মেরে পৃথিবীব্যপী অস্ত্র নির্মাণের ধ্বংস শক্তির এই আয়োজনের পাশে দাড় করান কবি এ কবিতায় সূর্য সেনের স্ট্রীটের ভোজপুরী বালকটিকে। শিয়ালদাগামী দুঃখী মানুষগুলোর জন্য রুটি তৈরী করে যে প্রাত্যহিক দৃষ্টান্ত তৈরী করে চলেছে, তার কাছে অস্ত্রপ্রসূ (আমেরিকা) দেশের প্রেসিডেন্ট বুশও যে নয় পায়ের যোগ্য। এ যেন ধনতন্ত্রগর্বী, সভ্যতার আস্ফালনকারী আন্তর্জাতিকতার মূলে গণতন্ত্রপ্রেমী দরিদ্রের চপেটাঘাত।

একদিকে শক্তির প্রতিযোগিতায় অস্ত্রের বেসাতি, বিশ্বায়ন ও পণ্যায়নের নামে বঞ্চিতের শোষণ, অন্যদিকে দারিদ্রের অসহায় আত্মসমর্পণ, কিংবা এক দারিদ্রের জীবিকায় অন্য দারিদ্রের ক্ষুধা নিবৃত্তি অথবা উপজীবিকাকে বাঁচিয়ে রাখার নিদারুণ এই প্রয়াসই কবিতাটিকে বাস্তবধর্মী করে তুলেছে।

একই ভাবনাকে প্রকাশিত হয়ে উঠতে দেখতে পাই 'সোজা বাংলায় একটি কবিতার মধ্যে দিয়ে। কবি সেখানেও, যে কথাটি বলেন তা হলো:

দুঃখী শ্রমিক
পিতৃহারা বালক
ভূমিহীন মানুষ
আমরা আবেগে গলার শিরা ফুলিয়ে তোমাদের বলেছিলাম
ভেবো না, আমরা সঙ্গে আছি
আমরা কি সত্যিই আছি?
('সোজা বাংলায় একটি কবিতা')

কবির 'ঋক্ষমেষ কথা' কবিতাটি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি সেখানে কবির স্বাতন্ত্র্যের ভাবনায়, তাঁর কবি স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে কবিতাটি আলোচনার আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তবে এ কবিতাটির একটি আলাদা তাৎপর্যও আছে। একসময় কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত কবির এ কবিতাটি পড়ে কবিকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন 'দুর্বোধ্যতার উপাসক' বলে। কবিতাটি যে দুর্বোধ্য তা একাধিক সাক্ষাৎকারে কবি নিজেই বলেছেন। তবু এ কবিতাটির অন্য তাৎপর্য কবির নিজের মতে সত্তরের নকশাল আন্দোলনের স্মৃতিবাহিত। কবির ভাষায়: "সেই সময়কার একটা ঘটনা আমি এখনো ভুলতে পারিনা। হয়তো 'ঋক্ষমেষ কথা'র পিছনেও তার প্রভাব ছিল। তখন শরৎকাল। সকালবেলায় চৌধুরীপাড়ার ভাড়াবাড়িতে শুনতে পেলাম বেড়া পেরোনোর শব্দ, একজন ঢুকে দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দেখলাম গোরাদা। গোরাদা তখন নকশাল, কৃষ্ণনগরের ত্রাস। পুরোটা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। তারপর ঝোলা থেকে মায়াকোভস্কির একটা কবিতার বই বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো, "তুই এটা পড়। এটা তোর কাজে লাগবে"। হয়তো 'ঋক্ষমেষ কথা'র 'ঋক্ষমেষ' এর মতোই সমাজ বিপ্লবী নকশাল আন্দোলনকারীরা যে সমাজের হিতকল্পে তাঁদের মৃত্যু ব্রতের সংকল্পে পবিত্র জীবনাহুতি দেয় সেই সমাজের কাছে তো বটেই এমন কি তাদের পিতা মাতা ও পরিবারের কাছেও মৃত্যুবধি তারা ব্রাত্য রয়ে যায়- রয়ে যায় অজানা, অচেনা, আতঙ্কের প্রতীক এক অসামাজিক জীব রূপে। সেই-ই তাঁর পরিণতি। এক সংগোপন বেদনা (সমবেদনা নয়) মিশে যায় তাঁর কবিতার এ বিমিশ্র ভাবনায়।

'সোজা বাংলায় একটি কবিতা' সত্যিই সোজা বাংলায় সোজা একটি সত্যভাষণ। রাজনীতির প্রতিশ্রুতি গরীবের চোখের জল মোছাতে পারেনা কারণ সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয়না। 'রুটি' কবিতাটির পংক্তির সাথেও এর বেশ কিছু মিল আছে যেমন: 'রুটি' কবিতায় 'কে যে কি বিক্রি করে/আর কে যে কি কেনে সেটা এখনো একটা রহস্য'। ভাবধর্মেও কবিতা দুটির মধ্যে বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

'আড়াই হাত মানুষ' কবির প্রথম জীবনে লেখা কবিতা। জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কবির বড়ো হয়ে ওঠা। কবি নিজেই একসময় বলেছেন যে প্রেমের অনুভূতি থেকে কবিতা লেখার ঘটনা ঘটেনি তাঁর জীবনে। আর তাই আড়াই হাত পরিসরের মানুষ নামক জীবের ভালো থাকা, মন্দ থাকা কিংবা দৈনন্দিন বেঁচে থাকার কড়চাকে এভাবেই এ কবিতায় তুলে ধরেন কবি। এ মানুষ বাঙালী মনের ঈর্ষাকাতরতা, পরশ্রীকাতরতা আর পরস্পরকে টেক্কা দিয়ে উপরে পৌঁছাবার পথে প্রয়াসী বাঙালী। এ বাঙালী ভন্ড প্রেমিক যে নিজের নারীকে ভালো না বেসে অন্য নারীর কাছে ভালোবাসা পেতে চায়, যে মানুষ নিজের পাহাড় প্রমাণ স্বপ্ন আর আশার কল্পনা করে তাকে আয়ত্ত করা তার পক্ষে সাজে কি না একথা না ভেবেই। কবির ভাষায়:

আমরা পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, পরাভূত
আমরা নদীর তীরে বসে থাকি, চন্দ্রাহত
আড়াই হাত মানুষ, আমাদের আনন্দও আড়াই হাত
দুঃখও আড়াই হাত
অমরাবতীর দিকে নিজেরা না যেতে পারি, বাচ্চাদের দিয়ে
কয়েকটা বেলুন তো পৌঁছে দিতে পারি? ('আড়াই হাত মানুষ')

আসলে স্বপ্ন ও কল্পনার দিকে ধাবমান মানুষের ইচ্ছা এবং প্রাপ্তি সামান্য, আশা ও সুখের প্রাপ্তি পরিমিত কারণ উদ্যম ও প্রচেষ্টাহীনতাই সেই পরিমিতির জন্ম দিয়েছে। কবি এ কবিতায় শিশুর উপমায় (বাচ্চাদের দিয়ে) সেই কল্পনার প্রসারতা, উদ্যমের প্রবলতার সন্ধান দিতে চান যা আমাদের প্রাপ্তিকে তার কঠিন লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

কবি তার 'দিনের বেলার ভাষা' কবিতায় বলেন:

'আমি একটাই ভাষা জানি, দিনের বেলার ভাষা,
সন্ধ্যেবেলার ভাষা আমি জানিনা' ('দিনের বেলার ভাষা')

এ কবিতাতেও 'সবচেয়ে দুঃখীর মুখ' চেনার মধ্যে দিয়ে কবি ঘোষণা করতে চান অর্থ, প্রাচুর্য, বৈভব কিংবা প্রেম ও যৌনতার সৌরভের থেকেও তার কাছে বড় মানুষের দুঃখ, বঞ্চনার জীবন। 'সাদা গোলাপ', 'সাদা চাদর', উপমার মধ্যে দিয়ে সেই সহজ, সাধারণ অথচ সুন্দর জীবনের শরিক তিনি।

'বুড়িমা কীরকম হবে' কবিতাটি পড়লে আপাতদৃষ্টিতে নন্দীগ্রাম, নেতাই এর কথা মনে ভেসে ওঠে। কিংবা মনে ভেসে ওঠে 'গড়বেতা' এর ছবি। এ কবিতাতেও দেখি বুড়ি মা জানে রাজনীতির সংঘর্ষে তার ছেলে ঘরে ফেরেনি, হয়তো ধড় থেকে তার মুণ্ডু আলাদা করে পুঁতে দেওয়া হয়েছে মাটিতে। গ্রামের মেয়েটি ঘাটে এসেও অনুভব করে চতুর দেহলোভী হায়নারা এসে ভিড় করেছে খিড়কির পেছনটাতে সেও হয়তো কোনো সুপ্রভাতে হবে রাজনৈতিক শোষণের শিকার। তবু গ্রামে উৎসব হয়, বাড়ির ছেলে ঘরে ফেরেনি- তবু কোজাগরী লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ঘরে পড়ে। বুড়ি মার তবু সংশয় কাটে না। একদিকে উৎসব ও অন্যদিকে মৃত্যুময় আতঙ্ক এ সংক্ষিপ্ত কবিতার সংক্ষিপ্ততর ছত্রে ছত্রে ছত্রাকারে ছড়িয়ে যখন কবি বলেন:

বেজে ওঠে শঙ্খধ্বনি
দরজায় পুলিশ থামে
বুড়ি মা প্রশ্ন করে
খোকনের মুণ্ডু পেলে? ('বুড়িমা কি রকম হবে')

'বুড়ি মা'র এই প্রশ্নে জীবনের কোন স্পন্দন নেই তা শুধুমাত্রই এক information যা সমকালের বিভীষিকাময় রাজনৈতিক হিংসা ও গণহত্যার ভিত্তিমূল থেকে উঠে আসে। সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণ রয়েছে 'নতুন সংবিধান' এর মতো কবিতায়। কবি জানেন, রাজনৈতিক হিংসা, ধর্ষণ আর ক্ষুধার যন্ত্রণাই শেষ নয়, অনেক গান- অনেক পাখির দেশ ভারতবর্ষে গরিব চাষী মাঠে ধান বুনে, বস্তিতে কলোনিতে খেটে, রক্তদানের পূণ্যে, জীবন দানের পূন্যে কাঙ্খিত স্বপ্নকে পূর্ণ করবে। যেখানে সাম্প্রদায়িকতা নেই- যেখানে গফুর মিয়ার ছেলের সাথে হিন্দু মেয়ে সীতার অনায়াসে বিয়ে হয়, সেখানে এ কোন রাষ্ট্রনীতি যার বলে একজনের নাম থাকে ভোটার লিস্টে আর একজন দাঙ্গায় পুড়ে মারা যায়? গরীবের ক্ষুধার অন্ন নিয়ে জুলুম, গরীবের মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে জুলুম-রাষ্ট্রের এ জুলুম আর চলবে না। জেহাদের ভঙ্গিমাতেই যেন কবি সাধারণের মধ্য থেকে সমস্বরে বলে ওঠেন:

আমরা মরিনি আমরা এখনও বেঁচে
ভারতবর্ষে এখনও অনেক গান
পোড়াতে এসেছি ধর্মতলার মোড়ে
পুড়িয়ে মারায় নতুন সংবিধান ('নতুন সংবিধান')

এ কবিতাটির মধ্যেও সাম্প্রদায়িক গুজরাট দাঙ্গার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াটিকে কবি-মানসের মধ্যে দিয়ে খুঁজে পাই।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। শ্রেষ্ঠ কবিতা, সুবোধ সরকার, দে'জ পাবলিশিং,পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৩
২। তদেব
৩। দ্রষ্টব্য তুমি কার দেওয়াল? না কি মনস্কাম? সংবাদ প্রতিদিন, জানুয়ারী ২০১৫
৪। দ্রষ্টব্য সাক্ষাৎকার, শিমূল সালাহউদ্দিন, ঢাকা, শিলালিপি পত্রিকা, ৩১/১০/২০১৪
৫। শ্রেষ্ঠ কবিতা, সুবোধ সরকার, পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা
৬। দ্রষ্টব্য সাক্ষাৎকার, শিমূল সালাহউদ্দিন, ঢাকা, শিলালিপি পত্রিকা, ৩১/১০/২০১৪
৭। তদেব
৮। তদেব (দ্রঃ এই মুহূর্তে আমিই মনে হয় সবচেয়ে আক্রমণের ভেতরে আছি)
৯। তদেব ও সাক্ষাৎকার পায়েল সেনগুপ্ত, দেশ, ৩১/১০/২০১৪
১০। সাক্ষাৎকার পায়েল সেনগুপ্ত, দেশ, ৩১/১০/২০১৪